আলোচ্য বিষয়ঃ কপালকুণ্ডলা চরিত্র

* কপালকুণ্ডলা চরিত্র :

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মধ্যমণি কপালকুণ্ডলা চরিত্র। তিনি এই উপন্যাসের নায়িকা। পরিকল্পনার অভিনবত্বে এই চরিত্র বাংলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান প্রয়াসী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন প্রকৃতি দুই রূপে মানব জীবনে আবির্ভূত — একটি সমাজ শাসনানুসারী নারীরূপিণী প্রকৃতি, আর একটি নিসর্গরূপিণী প্রকৃতি।... নারীই তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়। প্রকৃতির এই নারীরূপই কপালকুণ্ডলার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে আর এই জন্যই মুক্তস্বভাব নিসর্গ অরণ্য নদী সমুদ্র আকাশ এই সকলের প্রতি কপালকুণ্ডলার সহজাত অবোধপূর্ব আকর্ষণ।

শুধু পরিকল্পনার অভিনবত্বে নয়, সৃষ্টিকৌশলের দিক থেকেও কপালকুণ্ডলা চরিত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়িকা, আখ্যানভাগে তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে। নবকুমারকে বিস্মিত করে এই বনদেবী-সদৃশ নারী প্রথম দেখা দিয়েছিলেন। নবকুমারের মনে হয়েছিল সম্ভবত এ কাপালিকের মায়া এবং এই অনিন্দ্যসুন্দরী দেবী না মানবী সে সম্পর্কেও তাঁর মনে সংশয় জেগেছিল, অতঃপর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই নারী পুনরায় দেখা দেন এবং বধ্যভূমিতে কাপালিকের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেন। প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারীর বক্তব্যের মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে কপালকুণ্ডলার পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণ কন্যা। ইনি বাল্যকালে 'দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর' কর্তৃক অপহৃত হন, পরে যান ভঙ্গের কারণে তারা কপালকুণ্ডলাকে এই সমুদ্রতীরে পরিত্যাগ করেন। কাপালিক তাকে আপন যোগসিদ্ধি মানসে প্রতিপালন করেছিলেন। শৈশবে মাতাপিতার স্নেহক্রোড় থেকে বিচ্যুত এই কিশোরীর জীবন পরাশ্রিত। কিন্তু কঠোর স্বভাবের মানুষ কাপালিকের সান্নিধ্যে কিভাবে কেটেছিল, কিশোর বয়ঃসন্ধির রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলি প্রকৃতির বিশাল পটভূমিকায় অতিবাহিত হয়েছিল, লেখক সে সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, অথচ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য তথ্য উদ্‌ঘাটনে কপালকুণ্ডলার এই অতীত জীবনের পটভূমিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম। অরণ্য এবং কাপালিক এ দুয়ের প্রভাব কপালকুণ্ডলার জীবনের সংস্কার বা বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটিকে নির্মাণ করেছিল।

কপালকুণ্ডলার জীবনের পরিণাম অতিশয় করুণ। আত্মানবোধ যখন তাঁকে প্রথম দেখা যায় তখন তিনি ষোড়শী, এখানে মোট এক বছরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুকালে কপালকুণ্ডলার বয়স ছিল সতেরো। কপালকুণ্ডলার জীবন আগাগোড়াই নিয়তিলাঞ্ছিত। কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে মুক্ত করা ছাড়া তাঁর জীবনের কোনো ঘটনাই স্ব-ইচ্ছায় চালিত হয়নি, হয় Destiny অথবা কাপালিক কিংবা মতিবিবির মত Human Agent of Destiny দ্বারা তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত। সমুদ্রতীরের অনুভূমিতে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে মুক্তানের সান্নিধ্যে। এঁদের একজন কাপালিক, অপরজন অধিকারী, উভয়েই মনেপ্রাণে দৈবীশক্তির উপর আস্থাশীল। এঁদের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা কপালকুণ্ডলার মনেও দৈবীশক্তির প্রতি অন্ধবিশ্বাস সক্রিয় ছিল। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলিতে তিনি দৈবাদেশের ইঙ্গিতে চলেছেন বলে মনে করেছেন। বিবাহের পূর্বে এবং স্বামীর সঙ্গে সপ্তগ্রামে দেবীর উদ্দেশ্যে বিল্বপত্র অর্পণের ঘটনার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রথম ক্ষেত্রে দেবী বিল্বপত্র গ্রহণ করেছেন বলেই তার বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেবীর পদতল থেকে বিল্বপত্র বিচ্যুত হয়েছিল। এই ঘটনা কপালকুণ্ডলার কাছে দৈবী নিষেধ বলেই মনে হয়েছে। কপালকুণ্ডলা নিজেই বলেছেন —

> "আমি মার পাদপদ্মে বিল্বপত্র না দিয়া কোনো কর্ম করিতাম না, যদি কার্য শুভ হইবার হইত, তবে মা বিল্বপত্র ধারণ করিতেন, যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে বিল্বপত্র পড়িয়া যাইত।"

উপন্যাসে অধিকারী খুব অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে কপালকুণ্ডলার বিবাহ পূর্ব জীবন সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদিও সব কিছু অনাবিষ্কৃত। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কন্যাধিক স্নেহ করতেন, তিনি তাকে বিদ্যাশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, কিন্তু সামাজিক বিধিবিধান ও বৈষয়িক জ্ঞানধারণা সম্পর্কে কপালকুণ্ডলা ছিলেন অজ্ঞ। ভিখারীকে মূল্যবান গহনা দান এবং ভিখারীর পলায়ন সম্পর্কে কপালকুণ্ডলার বিস্ময়ের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করেছেন। এমনকি বিবাহ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। একারণেই নবকুমারের সাথে তাঁর বিবাহ প্রস্তাব শুনে কপালকুণ্ডলা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন; তখন অধিকারী তাকে অত্যন্ত সহজ ভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন —

> "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান, এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে, জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।"

উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে স্বদেশে উপনীত হলেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের প্রত্যাবর্তনকে নবকুমার-এর পরিবার এবং গ্রামবাসীরা সহজ মনে গ্রহণ করেছিল। নবকুমারের গৃহে কপালকুণ্ডলা সাদরে গৃহীত হলেও নবকুমারের মানসিক শান্তি ছিল না। কারণ স্বামী কিংবা সংসার কোনো কিছুর প্রতি কপাল-কুণ্ডলার কোনো আকর্ষণ ছিল না। নবকুমারের গৃহে আসবার পর তাঁর নামকরণ হয়েছিল মৃন্ময়ী, বাস্তবিক সংসারে কপালকু-ণ্ডলা মৃন্ময়ী বা মাটির পুতুলের মতোই অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নবকুমার ভগিনী শ্যামার প্রযত্নে মৃন্ময়ীর মধ্যে বাহ্য কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। যেমন কপাল-কুণ্ডলা তাঁর বিশাল কেশরাশিকে বেণীবিন্যাসে আবদ্ধ করে রূপ-সজ্জায় সুসজ্জিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু সাংসারিক গৃহ-ধর্মে তাঁর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি শ্যামাকে বলেছিলেন — "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

তাঁর পূর্বের অরণ্যচারী জীবনের প্রভাব থেকে তিনি যে মুক্ত হননি তার প্রমাণ আছে এই উক্তিতে —

"বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলাকে সম্পূর্ণ হৃদয়হীনরূপে কল্পনা করেননি। সমুদ্রতীরে অপরিচিত নবকুমারকে দেখে তিনি মমতা অনুভব করেছিলেন বলেই জানতে চেয়েছিলেন তিনি পথ হারায়েছেন কিনা। সাগরতীরের বাসভূমি ত্যাগ করার সময় তাঁর কাপালিক ও অধিকারীর জন্য বেদনা অনুভব হয়েছে। পথে মুহূর্তের [illegible] ভিক্ষুকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। শ্যামার প্রাণ-[illegible] নিজেকে অপরাধী করে বনভূমিতে ঔষধি সংগ্রহ করতে গিয়েছেন। মতিবিবির অনুরোধে শেষে নিজেকে নবকুমারের জীবন থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছেন। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলেছিলেন — "একবার বল যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও", তখন কপালকুণ্ডলা মর্মস্পর্শী উত্তর দিয়েছিলেন —

"তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই ;

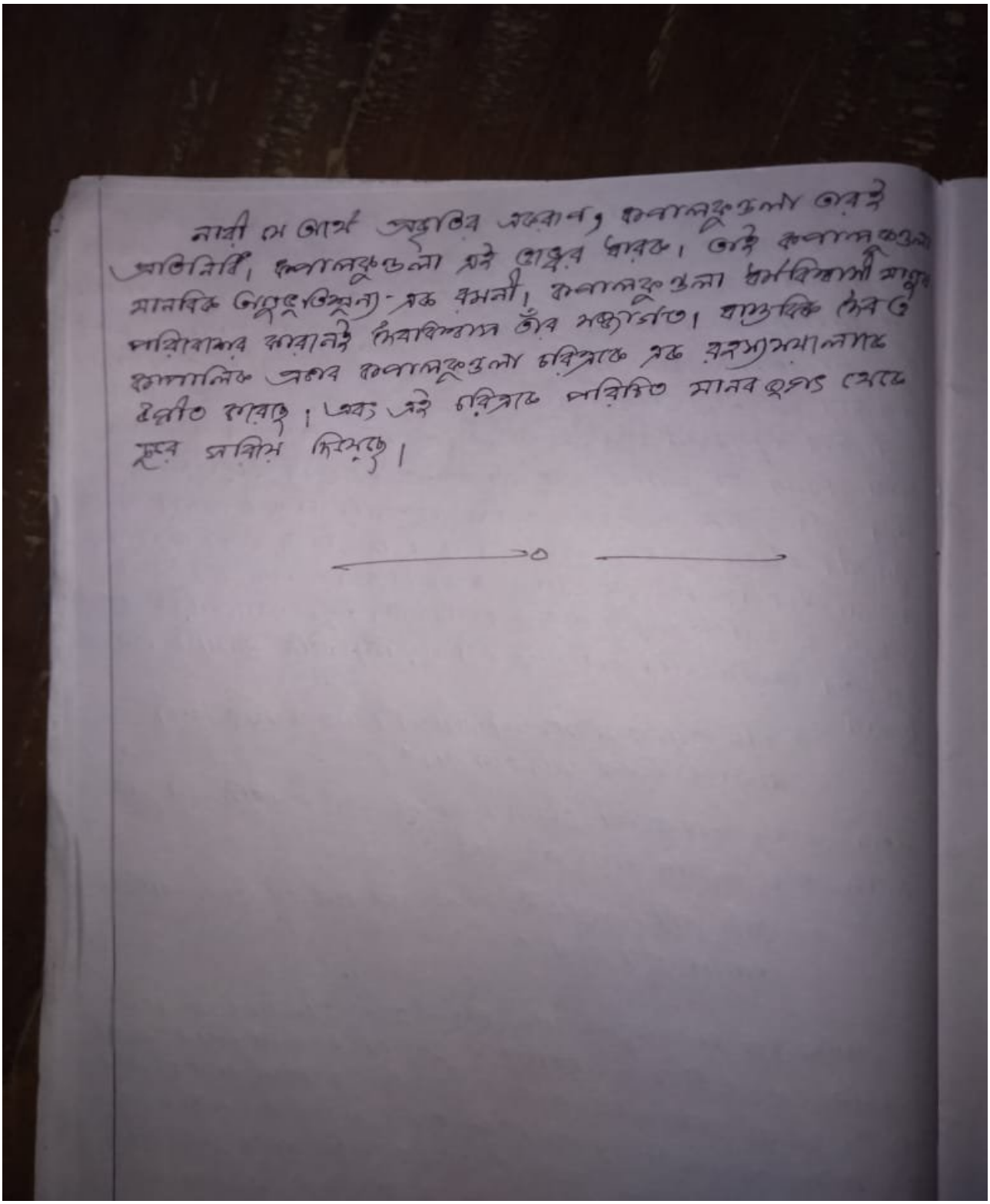

নারী যে অর্থে প্রকৃতির একরূপ, কপালকুণ্ডলা তারই প্রতিনিধি। কপালকুণ্ডলা এই ভাস্বর ধারক। তাই কপালকুণ্ডলা মানবিক অনুভূতিশূন্য-এক রমনী। কপালকুণ্ডলা ধর্মবিশ্বাসী মানুষ পরিবেশের কারণেই দৈববিশ্বাস তাঁর সজ্জাগত। বাস্তবিক দৈব ও কাপালিক প্রভাব কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে এক রহস্যময়ালাকে উন্নীত করেছে। এবং এই চরিত্রকে পরিচিত মানবজগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।